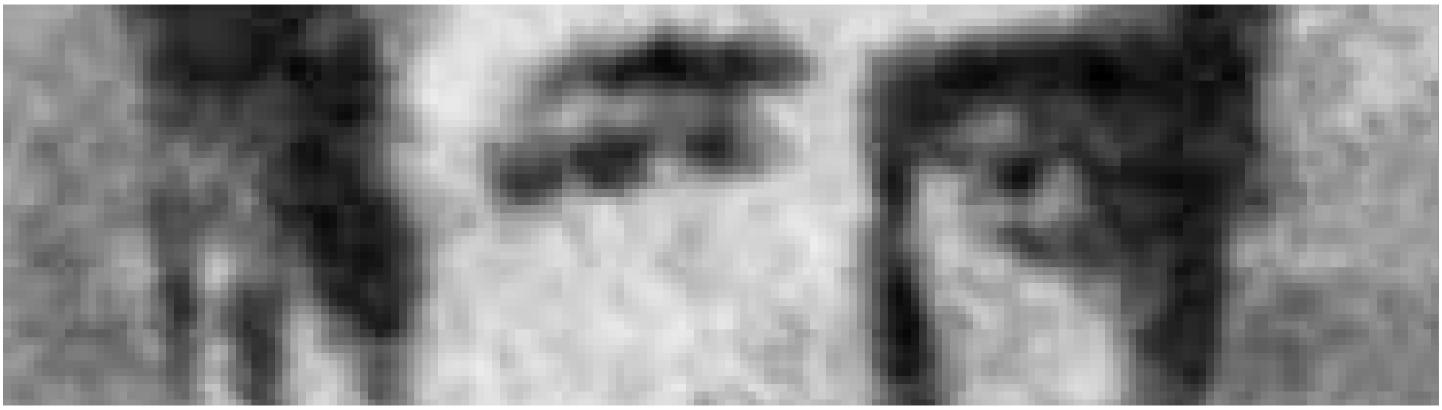

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন - শতবর্ষ পরে ফিরে দেখা

ফাহমিদ-উর-রহমান

২০১০ খ্রিষ্টাব্দ ছিল ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের মৃত্যু শতবার্ষিকী। গিরিশচন্দ্র সেন বাংলা ভাষার কোরআন শরীফের প্রথম তরজমা করে মশহুর হয়েছেন- এ তথ্য সবার জানা। বাঙালি মুসলমান সমাজে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণও এটা। তিনি শুধু কোরআন শরীফের তরজমা করেননি, তিনি যে ৪২ টি পুস্তক রচনা করেছিলেন তার সিংহভাগই ছিল মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে লেখা। সাধারণ বাঙালি মুসলমানরা আরবি-ফার্সি-উর্দু জানে না। ফলে তাদের প্রিয় কেতাবগুলো পড়তে পারে না। ওইসব গ্রন্থে যেসব মূল্যবান বাণী আছে তাও তাদের অন্যের মুখে শুনে পরিতৃপ্ত হতে হয়। গিরিশচন্দ্র সেন পবিত্র কোরআন শরীফের তরজমা করে এবং মুসলিম সংস্কৃতি ও মনীষার ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ লিখে আজ থেকে শতাধিক বছর আগে বাঙালি মুসলিম সমাজের জন্য প্রভূত উপকার করে গেছেন। যখন কোরআন শরীফের কোনো বাংলা তরজমা ছিল না, এমনকি ইসলাম সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি, তখন গিরিশচন্দ্র তাঁর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফল দিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজকে কতভাবে ঋণী করে গেছেন, তা লিখে প্রকাশ করা যাবে না।

গিরিশ চন্দ্র ছিলেন পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক ও সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ। উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজে যখন ধর্মীয় মোহগ্রস্ততা ও সাম্প্রদায়িকতার বাড়বাড়ন্ত, সেই কালে নিজে অসাম্প্রদায়িক হওয়ার কারণে সর্বোচ্চ মনোযোগ, ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ দিয়ে তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও মুললিম সমাজ ও সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের ওপর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে সেইকালে মৌলভী গিরিশচন্দ্র সেন হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। সমকালে এবং পরবর্তী সময়ে গিরিশ চন্দ্র কৃত বাংলা কোরআন শরীফ বাঙালি মুসলমান সমাজে বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল।

> অনুবাদকের জীবদ্দশাতেই এটির একাধিক সংস্করণ সেই জনপ্রিয়তার প্রমাণ। বহুদিন পর মাওলানা আকরাম খাঁ গিরিশ চন্দ্রের সেই ঐতিহাসিক অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এভাবে- সমকালে আরবি-ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত বাঙালি মুসলমানের অভাব না থাকলেও এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার কথা তাদের মাথায় আসেনি। তাদের অবহেলিত জরুরি কর্তব্য কর্মটি সম্পাদন করলেন বাংলার একজন হিন্দু সন্তান। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। গিরিশচন্দ্রের এই অসাধারণ সাধনা ও অনুপম সিদ্ধিকে জগতের অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গিরিশচন্দ্র কোরআন বা মুসলিম সংস্কৃতি নিয়ে অন্যান্য তরজমা বা লেখাজোখা না করলে সেগুলো কি লিখিত হতো না? হতো অবশ্যই। কিন্তু তাতে হয় তো আরও কয়েক দশক লেগে যেত। এই দীর্ঘ সময় শুধু বাঙালি মুসলমানরাই নয়, অন্য ধর্মের উদারপন্থী মানুষও কোরআন বা মুসলিম সংস্কৃতি ভিত্তিক লেখাজোখা থেকে বঞ্চিত হতো। তাই গিরিশ চন্দ্রের এই পরিশ্রম বাঙালি মুসলমান সমাজকে এগিয়ে আনতে সাহায্য করেছিল বলা যায়, তেমনি তা ধর্মীয় সহনশীলতা ও আন্তধর্মীয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক বড় অবদান রেখেছিল।

অথচ এই মহান, অসাম্প্রদায়িক মৌলভী সম্পর্কে ধর্ম হিসেবে মুসলমানরা যেমন উদাসীন, তেমনি জাতি হিসেবেও আমরা নির্লিপ্ত। গিরিশচন্দ্রের প্রিয় শহর ছিল ঢাকা। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন সেই কালের ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রূপগঞ্জ থানার পাঁচদোনা গ্রামে। মৃত্যুর আগে অসুস্থ গিরিশচন্দ্র প্রিয় শহর ঢাকায় জীবনের শেষ কটা দিন কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মৃত্যুর আগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তেমনি ১৯১০ সালের ১৫ আগষ্ট তাঁর মৃত্যুর পর উভয় সম্প্রদায়ের বহুমানুষ তাঁর শ্মশানযাত্রী হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর একজন ভক্ত মুসলমান ব্রাহ্ম সমাজের দফতরে চিঠি লিখে এভাবে আক্ষেপ করেছিলেনঃ আজ বঙ্গীয় মুসলমানদিগের একজন সুহৃদ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। হায়! কে আর এখন আরব্য ও পারস্য ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়া মুসলমানদিগকে ইসলামের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন?

গিরিশচন্দ্রের প্রিয় শহর ঢাকায় তাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকীতে কোনো অনুষ্ঠান হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে খুব কিছু উল্লেখযোগ্য লেখাজোখা হয়েছে বলে চোখে পড়েনি। ইসলামের বন্ধু এই প্রাতঃস্মরণীয় মানুষটির স্মৃতিবার্ষিকী নীরবে বিদায় নিয়ে আমাদেরই লজ্জিত করে গেছে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম আগ্রহী হয়ে উঠার পেছনে এই ব্রাহ্মধর্মটাই ছিল বড় কারণ। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি মূল আরবী ভাষায় কোরআন-শরীফ পড়ে এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তুলনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ প্রথা মানবিক কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তি ধর্মের অনুকূল নয়। তাই এসবের প্রতি তাঁর একধরনের অশ্রদ্ধা জন্মে। তিনি হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে সংস্কারের চেষ্টা করেন এবং উপনিষদকে ভিত্তি করে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের পত্তন করেন। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম সংস্কারমূলক আন্দোলন সেকালের হিন্দু সমাজে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল এবং হিন্দু সমাজের বহু প্রতিভাবান, প্রভাবশালী ও গুণীব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল অন্যতম। ব্রাহ্মসমাজের একজন বিখ্যাত নেতা ছিলেন কেশব চন্দ্র সেন। মূলত কেশব চন্দ্রের প্রভাবে গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং তাঁর এক জীবনীকারের ভাষায় উগ্র হিন্দু থেকে সমন্বয়বাদী ব্রাহ্মে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্র যখন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন (১৮৩৫) তখন বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, ইংরেজী ভাষার প্রচলন শুরু হয়েছে এবং তাঁর পরিবারেও তা গ্রহণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু তখন বাংলার সমাজ জীবনে আরবি-ফার্সির ব্যবহার একেবারে উঠে যায়নি। গিরিশ চন্দ্রের এক পূর্ব পুরুষ ছিলেন মুর্শিদাবাদের নওয়াবদের প্রভাবশালী দেওয়ান। গিরিশচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে তাই মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির ভালোমতো পরিচয় ছিল। এ কারণেই গিরিশচন্দ্র রীতিমত বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ

আমার মনে হইতেছে বিধাতার বিধানের চক্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি ইংরেজি শিক্ষায় নিরন্তর রত থাকিলে সময়ে একটা বড় কেরানি হইয়া বড়লোক হইয়া বসিতাম, আমাকে আর পরিণত বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে যাইয়া কষ্ট করিয়া আরব্য ভাষার চর্চা করিতে হইত না। কোরআন ও হাদিস ইত্যাদির অনুবাদ আমার দ্বারা হইয়া উঠিত না।

গিরিশ চন্দ্র যে কোরআন শরীফের তরজমা করেছিলেন ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থ লিখেছিলেন, তার মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন কেশব চন্দ্র সেন। তিনি মনে করতেন উপনিষদ, বাইবেল ও কোরআনের মূল কথা হচ্ছে একেশ্বরবাদ। ঈশ্বর নিরাকার, এক ও অভিন্ন। তিনি আরবি-ফার্সি ভাষা ভালোভাবে জেনে ইসলামের মূলতত্ত্ব বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের দায়িত্ব দেন গিরিশ চন্দ্রের ওপর। তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ। গিরিশ চন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন;

যে ভারবহন যোগ্য সবল অশ্বপৃষ্ঠ, ঈশ্বর সেই ভার দুর্বল গর্দভপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন।
এক বিনয়ী জ্ঞানতাপসের হৃদয়রক্ত মোক্ষণ করা অনিবার্য আত্মস্বীকৃতিই বটে।

আরবি ও ফার্সি ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করার জন্য গিরিশচন্দ্র লক্ষ্ণৌ জান এবং সেখানে পণ্ডিত মৌলভী এহসান আলীর কাছে আরবী ব্যাকরণ ও ফার্সী দিউয়ানে হাফিজের চর্চা করেন। এরপর কলকাতায় এসে আরও কয়েকজন মাওলানার কাছে এই দুই ভাষার চর্চা করেন। পরে ঢাকায় এসে মৌলভী আলিমুদ্দীনের কাছে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ নেন। এভাবে তিনি কোরআন শরীফ তরজমা করার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু মুসলমান বিক্রেতা তাঁর কাছে এই পবিত্র গ্রন্থ বিক্রি করবে না বলে তিনি তা বন্ধু জালালুদ্দীনের সাহায্যে জোগার করেন। একই ভাবে তিনি বিদ্যালয়ের দফতরী মারফত হাদীস গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

গিরিশচন্দ্রের এই অসাধারণ সাধনার সঙ্গে তুলনা চলে একালের মুসলিম পণ্ডিত মোহাম্মদ আসাদ ও ইসলাম বিষয়ক লেখক মরিস

বুকাইলির। মোহাম্মদ আসাদ কোরআন শরীফের তফসীর লিখে এবং মুরিস বুকাইলী Bible, Quran and Science নামক বই লিখে মশহুর হয়েছেন। কিন্তু এই কাজের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ আরবী ভাষা আয়ত্ত করার জন্য দীর্ঘ দিন তাঁরা আরবে গিয়ে বসবাস করেছেন। এমনকি বেদুইনদের সঙ্গে চলাফেরা করে আরবী ভাষার ডায়ালেক্ট বুঝার চেষ্টা করেছেন। সেইকালে গিরিশ চন্দ্র শত প্রতিকূলতার মুখে যে সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন তা ভাবলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্ম হওয়ার জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁকে এক ঘরে করেছিল। তাঁর আত্মীয়স্বজন তাকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিল।

যাই হোক গিরিশচন্দ্র সেন জীবনের একটা সময় ময়মনসিংহ শহরে কাটিয়েছিলেন। কোরআন শরীফ তরজমা করার সময় তিনি এখানেই ছিলেন। কোরআন শরীফের প্রথম খণ্ডের তরজমা মুদ্রিত হয় শেরপুরের চারুযন্ত্রে।

গিরিশচন্দ্র শুধু কোরআন শরীফের তরজমা করেন নি। তিন পর্বে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সম্পূর্ণ জীবন চরিত তিনি রচনা করেছেন। ৯৬ জন ওলী-আওলিয়ার জীবনী নিয়ে তিনি লিখেছেন তাপসমালা।

এটি সুবিখ্যাত তাজকিরাতুল আওলীয়া গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদের ভুমিকায় ইসলাম দরদী এই মহাপ্রাণ মানুষটি লিখেছেনঃ মুসলমান জাতি সম্পর্কে বদ্ধমূল কুসংস্কার লোকের অন্তর হইতে দূর করিবে- এই উদ্দেশ্যে আমি তাহা ভাষান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

> গিরিশচন্দ্র মিশকাত শরীফের অনুবাদ করেছেন, রুমীর মসনবী শরীফ অবলম্বনে লিখেছেন তত্ত্বরত্নমালা, গুলিস্তা ও বুস্তা অবলম্বনে হিতোপদেশমালা। ইমাম হাসান ও হোসেনের অনুবাদভিত্তিক জীবনী, কয়েকজন ধর্মনেতার নামে খলিফাদের জীবনী এবং সাধ্বী মুসলমান নারীদের জীবনবৃত্তান্তও রচনা করেছেন। এমনকি উর্দু ভাষায় তিনি ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় গিরিশ চন্দ্রের রচনাবলীর অধিকাংশ আজ দুষ্প্রাপ্য। বাংলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠনের উচিত তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করে একটা জাতীয় কর্তব্য পূরণ করা।

গিরিশচন্দ্র মৃত্যুর আগে প্রস্তুত করা উইলে নিজের বই-পুস্তক সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতেও ফুটে উঠেছে এক সংবেদনশীল মানবিক মনের চিত্রঃ পুস্তক বিক্রয়ে এক্ষণেও লাভ হইতেছে না, যে টাকা পাওয়া যায়, নূতন মুদ্রাঙ্কনে তাহা ব্যয়িত হয়। সময়ে পুস্তকে লাভ হইতে পারে। লাভ হইলে তাহার এক চতুর্থাংশ প্রচার ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে, অবশিষ্টাশে দুঃখী জন্মভূমির অভাবমোচনে ব্যয়িত হইতে থাকিবে।

গিরিশচন্দ্র কখনো সক্রিয় রাজনীতি করেননি। তবে মানুষ হিসেবে তাঁরও রাজনৈতিক বিশ্বাস কিছুটা ছিল সেটা আমরা দেখতে পাই ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার মধ্যে।

একজন সৎ ধার্মিক, নীতিবান প্রতিবেশী হিসেবে তিনি পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিষয়ে আন্তরিক ছিলেন এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারেও ছিলেন সহানুভূতিশীল। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কল্যাণ হবে জেনেও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁকে সমর্থন করেন এবং এটাই তাঁর কাছে সেদিন ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছিল। সেকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে মুসলমানরা সামাজিকভাবে নানা রকম লাঞ্ছনার শিকার হতো। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্য যুক্ত হয়ে এ পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছিল। পূর্ববঙ্গের একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হিসেবে গিরিশচন্দ্র এটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।

ফলে বঙ্গভঙ্গের মধ্যে তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষের এক ধরনের মুক্তি আশা করেছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেনঃ

পূর্ববঙ্গের কল্যাণ হইবে, যে দেশ নানা বিষয়ে পশ্চাৎগামী ও অনুন্নত, এক্ষণ অগ্রসর হইবে। আমার জন্মস্থান ঢাকা জিলায়। সে স্থানে আমার বাসগৃহ আমি ঢাকা নিবাসী। ঢাকা রাজধানী হইল, ঢাকা অঞ্চলের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতে চলিল, ইহাতে আমার দুঃখ না হইয়া আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক।

তিনি মনে করতেন পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতি বর্ণহিন্দুদের ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করা উচিত। তিনি লিখেছেন উড়িষ্যাবাসীকে উড়িয়া ও বিহারীদের মাড়ুয়া বলার মতো পূর্ব বঙ্গবাসীকে যদি বাঙাল বলে অবজ্ঞা ও বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ছত্রিশ ধরনের জাতিভেদকে

দূর করা না যায়, তাহলে জাতীয় ঐক্য কোনোদিনই প্রতিষ্ঠিত হবে না।

কলকাতা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক রঞ্জন গুপ্তর লেখা গবেষণাধর্মী বই ভাই দিরিশচন্দ্র সেন। রঞ্জন গুপ্ত পূর্ব বাংলার মানুষ। জন্ম নরসিংদীর বাবুরহাট গ্রামে। বিভাগ-উত্তরকালে তখনকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কারণে তিনি ওপারে পাড়ি জমান। বইটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে তিনি স্বদেশের মাটির প্রতি এক ধরনের নস্টালজিয়া অনুভব করেন।

গিরিশ চন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ টিকে থাকলে এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন না করলে ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি কখনই খারাপ হত না। আর সে অবস্থায় ভারত বিভাগ, একই সঙ্গে বাংলা বিভাগ কোনটাই হত না। তাঁর এ মন্তব্যের সঙ্গে অনেকে একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু এটা সত্য, বর্ণহিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সেদিন বাঙালিদের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলা হলেও এটা ছিলো পুরোপুরি হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এটা কোন সেক্যুলার আন্দোলন ছিল না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের শ্রেণী সার্থে এই আন্দোলনের সূচনা করেছিল এবং কৌশলগত কারণে এটিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শাড়ি পড়ানো হয়েছিল। এর ভেতর দিয়েই সেদিন হিন্দু-মুসলমান বাংলা ভাষীদের মধ্যে তৈরী হয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজন। হিন্দু উচ্চ বর্ণে জন্মগ্রহণ করেও গিরিশচন্দ্র সেদিন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, ঔপনিবেশিক যুগের অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার বিপরীতে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। আজ তাই স্বাভাবিকভাবে বলা যেতে পারে, ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত পূর্ববঙ্গে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় গিরিশচন্দ্রের বিলম্বিত স্বপ্ন পূরণ মাত্র। কিন্তু গিরিশ চন্দ্র যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে জানা এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মধ্যদিয়ে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ত্বের যে পরিবেশ তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তা যেনো আজও অধরা রয়ে গেছে। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই আজ “নাগিনীরা ফেলিতেছে বিশাক্ত নিঃশ্বাস।”

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন এবং হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাততত্ত্ব প্রকাশের পর খ্রিস্টীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের এত দিন দস্তানার আড়ালে থাকা হিংস্র নখ আর গোপন থাকছেনা। সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান বিশ্ববাসীর ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারই এক বীভৎস রূপ আমরা দেখছি ইরাক, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে।এই সাম্প্রদায়িক সংঘাতের যুগে আমাদের বুশ-ব্লেয়ার ও তাঁর ছানাপোনাদের দরকার নেই। দরকার মরহুম মৌলভী গিরিশচন্দ্র সেনের মত মানুষ, যাঁরা সভ্যতার সংঘাত নয়, আন্তসভ্যতার ভেতরে আদান-প্রদান, ভাব বিনিময়ের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। কেবল এই পথেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব এবং আমাদের আরাধ্য এক বিশ্বমানবতা ও বিশ্ব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠাও হয়ত সম্ভব।

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)